‘রিনা ও রাজু’

নুসরাত আমিন নামিকো
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ১২
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

এক গ্রামে বসবাস করত একটি কৃষক। তার ছিল দুই সন্তান। একটি মেয়ে আরেকটি ছেলে। জন্মের দুই বছর পর কৃষকের স্ত্রী মারা যায়। কৃষকের মেয়ের নাম রিনা ও ছেলের নাম রাজু। কৃষকের বাড়ির সকল কাজ তার মেয়ে রিনা করতেন। আর তার ছেলে রাজু পড়াশোনা করত। কৃষক রাজুর পড়াশোনা নিয় খুবই সচেতন ছিলেন। কিন্তু তিনি রিনার পড়াশোনায় তেমন গুরুত্ব দিতেন না। রিনা পড়াশোনায় খুবই আগ্রহী ছিল। কৃষক রিনাকে দিয়ে সকল কাজ করাতেন।

কৃষক রিনার পড়াশোনার জন্য বই-খাতাও দিতেন না। রিনা তার সহপাঠীদের থেকেই বই নিয়ে পড়াশোনা করত। অন্যদিকে কৃষক রাজুকে সবসময় নতুন কলম, খাতা, পোশাক কিনে দিতেন। রাজুও রিনার সাথে ভালো ব্যবহার করতো না। কিন্তু রিনা এসব কিছু মনে করতো না। রিনা তার অবসর সময়ে বাড়ির অন্যান্য কাজ শেষ করতো ও কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়াশোনাও করতো। যা তার বাবা পছন্দ করতেন না। একদিন রিনা কাজ শেষে গ্রামের ছেলে-মেয়েদের সাথে খেলতে গিয়েছিল বলে রিনাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

রিনা অনেক কষ্টে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কৃষক আর রাজু বাড়িতে বসবাস করত। বহুদিন পরে রাজু যখন বড় হলো তার বাবা তাকে পাশের বাড়ির এক মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দিল। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই রাজুর স্ত্রী রাজুর বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করতো না। তাকে যথেষ্ট সম্মান দিতো না। তাকে যথেষ্ট খাবার দিতো না। রাজুর স্ত্রী ও তার বাবার মধ্যে সবসময় মনোমালিন্য থাকত। এই অশান্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাজু তার স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা বাড়িতে থাকতে শুরু করলো। এখন কৃষক বাড়িতে একদম একা থাকতেন। হঠাৎ কৃষক ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে কেউ দেখতে আসেননি। কৃষক একা একা কষ্টে ভুগছেন। এসব কথা তার মেয়ে রিনা জানতে পেরে দ্রুত তার বাবার কাছে চলে আসে। তার মেয়ে রিনাকে দেখে কৃষকের চোখে জল এসে পড়ে। রিনা তার বাবার সেবাযত্ন করে সুস্থ করে তুললো। কৃষক রিনার কাছে ক্ষমা চাইলেন। রিনা তার সকল কষ্ট ভুলে বাবার সাথে শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো।

লিমার নতুন স্কুল

শান্তা রানী সরকার
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ১৪
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

সকাল থেকেই প্রতিদিনের মতো মায়ের ডাক ভেসে আসে। লিমামণি, সকাল হয়েছে। তাড়াতাড়ি ওঠো। নাস্তা করে স্কুলে যেতে হবে কিন্তু।

লিমা ঘুম থেকে ওঠে, আদরের বিড়াল গুডডুকে খেতে দেয়। তারপর মুখ ধুয়ে তাড়াহুড়ো করে নাস্তা সেরে নেয়, মা ততক্ষণে স্কুলের ব্যাগটা রেডি করে লিমার কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়। স্কুলে যাওয়ার সময় তার চোখ পড়ে টেবিলের ওপর। বইয়েল একপাশে হাত-পা গুটিয়ে ঘুমিয়ে আছে গুডডু। লিমা একনজর দেখে মিষ্টি করে হাসে, তারপর ঘুমন্ত গুডডুকে টাটা বলে স্কুলের দিকে বের হয়।

স্কুল ছুটির পর বন্ধুদের সাথে লিমা বাড়ি ফেরে। অবুঝ মেয়েটি কিছুই বুঝতে পারে না। বাড়িতে এতো মানুষ কেন কই আমার গুডডুকেও যে দেখছি না। খালামণি ছোট্ট লিমাকে জড়িয়ে কেঁদে ওঠে আর বলে, লিমা তোমার মাকে দেখবে? লিমা ফিক্ করে হেসে ওঠে আর বলে, মাকে আমার দেখতে হবে কেন, আমি মার কাছেই এখন যাব। মা রান্নাঘরে ভাত রান্না করছে। একটু পরে আমাকে আর গুডডুকে গরম দুধ দিয়ে খেতে দেবে। জানো খালামণি, দুপুর হলে গুডডুকে সব সময় আমার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি কখন বাড়িতে ফিরব! আমি ওকে অনেক ভালোবাসি। খালামণি ছোট লিমার কথাগুলো শুনে লিমাকে জড়িয়ে কেঁদে ওঠে পাশের ঘরের ময়না ভাবি লিমাকে তার ঘরে দুধ দিয়ে ভাত খেতে দেয়। খাবারের পর নিষ্ঠুরের মতো বলে দেয়, তুমি স্কুলে যাওয়ার পর বিষাক্ত সাপের কামড়ে তোমার মা মারা গেছে। কথাটা শুনে লিমার মুখটা অন্ধকারে ছেয়ে যায়। জন্ম নেওয়ার আগেই বাবাকে হারিয়েছে। নদীতে মাছ ধরতে গেলে ঝড়ের মুখে পড়ে হায়াৎ আলী, তারপর তার আর বাড়ি ফেরা হয়নি। সেই কষ্টের কথাগুলো মায়ের কাছে শুনেছে সে, আজ মায়ের চলে যাওয়ার কথা শুনে বুক ভেঙে আসে। কষ্টে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে লিমা। অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারিয়ে এতিম লিমার জীবন যেন এলোমেলো হয়ে যায়। খালার বাড়িতে কাজের মেয়ের মতো কোনোভাবে বেঁচে আছে। এখন আগের মতো কেউ ডেকে বলে না– লিমামণি সকাল হয়েছে। ওঠো স্কুলে যেতে হবে। গুডডুও আগের মতো তিনবেলা খেতে পায় না। একদিন দুপুরবেলা গুডডু ক্ষুধার যন্ত্রণায় হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। লিমা পাতিল থেকে ভাত চুরি করে গুডডুকে খেতে দেয়। খালা দেখে লিমার চুল ধরে ঝাঁকুনি দেয়। লিমা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। এই সুযোগে খালা গুডডুকে গলায় রশি বেঁধে টেনে নিয়ে যায় রাঙাপুর নদীর তীরে। সাঁকোর মাঝখানে গিয়ে অনেক উপর থেকে গুডডুকে ফেলে দিয়ে বলে নিজে খেতে পায় না আবার মাসির দরদ। অসহায় গুডডু নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে কোনো এক ঠিকানাহীন বালুর শহরে চলে যায়।

লিমা ঘুম থেকে উঠে গুড্ডুকে না পেয়ে কেঁদে কেঁদে বাড়ি মাথায় তোলে। খালা কান্না থামাতে না পেরে লিমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। লিমার আজ এর বাড়ি কাল ওর বাড়িতে খেয়ে কোনোভাবে বেঁচে আছে। টোকাই'র মতো রাস্তায় তার বাস। একদিন লঞ্চে পানি বিক্রি করতে এসে চলে আসে ঢাকাতে। রাতে প্রচুর ঘুম পাওয়ায় ময়লার পাশে ঘুমিয়ে পড়ে লিমা। এক পাশে লিমা অন্য পাশে কুকুরগুলো ঘুমিয়ে আছে। সকাল হতেই কাকগুলো একসাথে ডেকে ওঠে। কুকুরগুলো ছোটছুটি করে খাবারের জন্য।

শহরের মানুষগুলো ছুটছে কর্মস্থলে। কেউ হেঁটে, কেউবা গাড়িতে। হঠাৎ করে একটি গাড়ি লিমার পায়ের ওপর উঠিয়ে দেয়। সাহেব তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে লিমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পায়ে ব্যান্ডেজ করে লিমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। সাহেব যখন লিমার পরিচয় জানতে চায়, লিমা কেঁদে কেঁদে তার কষ্টের কথাগুলো বলে। সাহেবের স্ত্রী রওশন আরা লিমার কষ্টের কথা শুনে কেঁদে ওঠে। রওশন আরার কোনো ছেলেমেয়ে নেই। তাই লিমাকে পেয়ে আনন্দে বুকটা ভরে যায় তার।

রওশন আরা আনন্দে বলে ওঠে আজ থেকে তুমি আমাদের মেয়ে। তুমি আবার নতুন করে স্কুলে যাবে। লিমার নতুন বাবা লিমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়। আজ লিমার নতুন স্কুলের প্রথম দিন। লিমা স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অনেক দিনপর হারানো স্কুল খুঁজে পেয়ে আনন্দে চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে।

মায়াদ্বীপ

টিনা মণ্ডল
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ০১
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ছিল এক দ্বীপ। যার নাম ছিল মায়াদ্বীপ। সেই ভয়াবহ মায়াদ্বীপের রানী ছিল মায়াবিনী এক ডাইনি। বিভিন্ন দেশের রাজকুমাররা সমুদ্র পথে ঐ দ্বীপের পাশ দিয়ে যখন যেত, সেই মায়াবিনী ডাইনি যাদুর বলে ওদেরকে মায়ার হরিণ বানিয়ে রাখত। কারণ ডাইনি জানত যেদিন সে একশজন রাজকুমারকে মায়ার হরিণ বানাতে পারবে, সেদিন সে সিদ্ধিলাভ করবে। অর্থাৎ অমর হয়ে যাবে। মায়াদ্বীপের হরিণদের মধ্যে সূর্যপুরের বড় রাজকুমারও ছিল। কেউ সেই ডাইনিকে হার মানাতে পারত না। সবাই খুব ভয়ে ভয়ে থাকত। এরই মধ্যে দেখতে দেখতে একটু বড় হয়ে উঠল সূর্যপুরের ছোট রাজকুমার। একদিন সে সব শুনে মায়াদ্বীপে অভিযান চালাবার প্রস্তুতি নিল। তারপর এক সোনালি আলোয় ভরা সকালে সঙ্গীদের নিয়ে সমুদ্রে ময়ূরপঙ্খী নৌকা ভাসাল ছোট রাজকুমার। নৌকা থেকে নেমে শাহজাদা ও তার বন্ধুরা এক গহিন বনে ঢুকল। সবাই চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগুতে লাগল। ওদের মনে হলো বড় অদ্ভুত এ বন। বিচিত্র রকমের গাছপালা যা কখনো দেখেনি। জঙ্গলের একটা খোলা জায়গায় তাঁবু টানাবার কাজে লেগে গেল বন্ধুরা। লাকড়ি জোগাড় করে পাশেই আগুন জ্বালাল। খাওয়ার সামগ্রী সাথেই ছিল তাদের। কিছুটা খেয়ে বিশ্রামে গেল সবাই। কিন্তু সবাইকে সাবধান করে দিল শাহজাদা। শাহজাহার নির্দেশ মতো চরম উৎকণ্ঠা বা সতর্কতার মধ্যদিয়ে রাত কাটল। এক সময় সূর্য উঠল বনের গাছপালা ঝলমলিয়ে। সবাই হাত-মুখ ধুয়ে ঝরঝরে হয়ে নিল। এবার চলার পালা। সবাইকে নিয়ে বনের পথ ধরে এগিয়ে চলল শাহজাদা। কিছুদূর যাওয়ার পর তাদের কানে ভেসে এলো চমৎকার মেয়েলি কণ্ঠের গান। তা শুনে শাহজাদা ও তার সঙ্গীরা ভীষণভাবে অবাক হলো আবার ভয়ও পেল। কারণ শুনেছে এ রকম নিঝুম বনে নাকি গান গায় মানুষকে বশ করার জন্য। কিন্তু তারপরেও গানের রেশ ধরে সেই দিকে এগুতে লাগল সবাই। খুব সবধানে উঁকি মারল গাছের আড়াল থেকে। দেখল ছোট্ট একটি মেয়ে গান গেয়ে ফুল কুড়াচ্ছে আর মালা গাঁথছে। তার পাশে আপন মনে মোহনীয় সুরে বাঁশি বাজাচ্ছিল বুনো নামের এক লোক। এক সময় মেয়েটি বলল, এতো সুন্দর বাঁশি বাজানো তুমি কোথা থেকে শিখলে। কোথায় শিখলে চাচা?

বুনো বলল, নিজের দেশের মাটিতে। সে অনেকদিন আগের কথা। মেয়েটি বলল, কদিন থেকে একটা কথা আমার খুব মনে আসছে। ঐ দূর সমুদ্রে কতো জাহাজ আসা-যাওয়া করে। হয়তো কোনো দিন, কোনো জাহাজ নোঙর করবে এই দ্বীপে। আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে এখান থেকে। আবার আমরা ফিরতে পারব আমাদের দেশে। তাই না চাচা? বুনো বললে, হ্যাঁ হতে পারে, সবই হতে পারে। তাদের কথাই ঠিক হলো, আড়াল থেকে বেরিয়ে শাহজাদা ও তার বন্ধুরা। শাহজাদা বলল, বাহ! কী চমৎকার গান করো তুমি আর কী সুন্দর বাঁশি বাজাও তুমি। এই জনমানবহীন নির্জন দ্বীপে ভাবিনি কোনো মানুষের দেখা পাব। বাঁশি থামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বুনো। একটু বিস্মিত হলো। বলল, কে তোমরা? কোথায় যাচ্ছ? শাহজাদা বলল, আমি সূর্যপুরের ছোট রাজকুমার। বেরিয়েছিলাম মায়াদ্বীপের সন্ধানে। বুনো বলল, তোমারা এসেছ মায়াদ্বীপের অভিযান। এই ফুলকুমারী তোমাদের অনেক সাহস দিতে পারবে। এই বন ও সমুদ্র এলাকায় এমন কোনো জায়গা নেই। যা ওর চেনা নয়। ফুলকুমারী বলল, ছোটবেলা থেকে এই বন আর সমুদ্র দেখে বড় হয়েছি। এখানকার প্রতিটি জিনিস আমার বড় চেনা। আমাকে তোমাদের সাথে নাও শাহজাদা। বুনো বলল, আমিই বা বাদ যাই কেন শাহজাদা। এই অভিযানে সঙ্গী হতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। অগত্যা সবাইকে নিয়ে পথ চলতে লাগল শাহজাদা। কিছুদূর যাওয়ার পর বুনো বলল, মায়াদ্বীপে ঢোকার আগে সমুদ্রে একটি বিশেষ জায়গা আছে, মোহনার কাছাকাছি।

ঐ জায়গাটাই খুব বিপজ্জনক। সব জাহাজের নাবিকেরা না জেনে ঐ জায়গার পাশ দিয়ে যায়। আর বিপদে পড়ে। এটা ডাইনির একটা মায়াজাল। কাজেই আমাদের খুব সাবধানে যেতে হবে। শাহজাদা বলল, এখানেই নোঙর করো। ঐ দেখা যাচ্ছে মায়াদ্বীপ। রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো আমরা এখন আর এগোবে না। সূর্য ওঠার সাথে সাথে মায়াদ্বীপে ঢুকে যেতে হবে। কারণ ডাইনি তখন ঘুমে অচেতন থাকবে। এক সময় একটু একটু করে ভোর হলো। ধীরে ধীরে ও খুব সাবধানে মায়াদ্বীপের কাছে এগুতে লাগল সবাই। ফুলকুমারী বলল, শাহজাদা দেখছ ঐ

হরিণগুলোকে। ওরা সব যাদু মায়ার হরিণ। আগে ওরা সবাই মানুষ ছিল। শাহজাদার কষ্ট ভারী হয়ে এলো। বলল, হয়তো এদের মধ্যে কোনটি আমার ভাই। বুনো বলল, মন খারাপ করো না, শাহজাদা। এতদূর যখন আসতে পেরেছ, ভাইকে নিশ্চয় উদ্ধার করতে পারবে। এক সময় নৌকা নোঙর করা হরা হলো। তীরে নেমে পড়ল সবাই। এগোতে লাগল খুব সাবধানে।

বনের হরিণগুলো আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দিনের আলোয়ও কেন আলো-ছায়ার জাল বোনা। হঠাৎ ফুরকুমারী শাহজাদাকে বলল, শাহজাদা দেখছ সেই দীর্ঘ। যার মধ্যে রয়েছে পদ্মফুল। এই পদ্মফুলের গুটিপোকার মধ্যে রয়েছে ডাইনির জীবন। ওরা আরও এগোল। শোনা যাচ্ছিল ডাইনির নাসিকা গর্জন। বুনো বলল, শোনো– আমাদের খুব তাড়াতাড়ি আর সাবধানে কাজ সারতে হবে। ডাইনি জেগে গেলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত যেন। ফুলকুমারী বলল, আমি যাব দীঘির রক্তপদ্ম আনতে। শাহজাদা বলল, সে হয় না ফুলকুমারী। এতটুকু মেয়ে তুমি কীভাবে যাবে সেই রক্তপদ্ম আনতে? ফুলকুমারী বলল, তুমি কিন্তু অন্য কোনো দিকে তাকাবে না শাহজাদা। আমি সেই রক্তপদ্মটা আনার সাথে সাথে এক চাপে ফুলের ভেতরের গুটিপোকাটা একেবারে মেরে ফেলবে। দেরি হলে কিন্তু সর্বনাশ হবে। শাহজাদা বলল, ঠিক আছে। তুমি নেমে পড়। নেমে পড়ল ফুলকুমারী বরফ শীতল দিঘির পানিতে। অনেক কষ্টে পৌঁছে গেল মাঝদীঘির সেই পদ্মফুলের কাছে। অনেক বড় বড় ঢেউ এসে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করল তাকে। কিন্তু হার মানাবার মেয়ে নয় ও। হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগল। প্রকৃতি যেন অশান্ত হয়ে উঠছে। দিঘির মাঝখানে কিছুতেই যেন নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না। দিঘির মাঝখানের রক্তপদ্মটা ভীষণভাবে কাঁপছে থর থর করে কিছুতেই হাত লাগাতে পারছে না ফুলকুমারী। পাড়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠল সবাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা সময় রক্তপদ্মটা ছুঁয়ে ফেলল। এবং সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে তুলে ফেলল পদ্মটা। প্রবলভাবে একহাতে স্রোত কেটে কেটে পাড়ে এসে উঠল এবং কোনো রকমে রক্তপদ্মটা শাহজাদার হাতে দিল। শাহজাদা তাড়াতাড়ি গুটিপোকায় চাপ দিল। না হচ্ছে না। ভীষণ শক্ত। ওদিকে বিকট জোরে হুঙ্কার করে তুলে ফেলল পদ্মটা। প্রবলভাবে একহাতে স্রোত কেটে কেটে পাড়ে এসে উঠল এবং কোনো রকমে রক্তপদ্মটা শাহজাদার হাতে দিল। শাহজাদা তাড়াতাড়ি গুটিপোকার চাপ দিল। না হচ্ছে না। ভীষণ শক্ত। ওদিকে বিকট জোরে হুঙ্কার করতে করতে এদিকেই আসছে ডাইনির সাঙ্গপাঙ্গরা। এই বুঝি ধরে ফেলল ওরা।

এবার আরো জোরে চাপ দিল শাহজাদা। কট্টস করে একটা শব্দ হলো জোরে। গর্জন করতে করতে কাছে এসে আছড়ে পড়ল ডাইনি। আর অমনি নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়ার মতো বেরিয়ে মরে গেল সে। বুনো মুহূর্তের মধ্যে রক্তপদ্মটা শাহজাদার হাত থেকে নিয়ে পাঁপড়িগুলো ছিটিয়ে দিল সাঙ্গপাঙ্গদের গায়ে। দেখতে দেখছে নিস্প্রাণ হয়ে এদিকে সেদিক পড়ে রইল সাঙ্গপাঙ্গদের দেহ। তারপর কালো ধোয়ার কুণ্ডলী, বাতাসে মিশে গেল সবার মরদেহ। তারপর সবাই মিলে দিঘির পানি ছিটিয়ে দিল মায়ার হরিণদের গায়ে। আর দেখতে দেখতে মানবসন্তানে রূপান্তরিত হলো সবাই। খুশিতে আত্মহারা হলো সবাই। শাহজাদাকে ঘিরে দাঁড়াল নবজন্ম পাওয়ার অন্যসব শাহজাদার। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো সূর্যপুরের বড় শাহজাদা। বলল, আমার ছোট ভাইটি তুমি বড় হয়ে এতবড় বীর হবে ভাবতেও পারিনি। কল্পনাও করিনি আবার জীবন ফিরে পাব। শাহজাদা বলল, আমার এই বন্ধুরা পাশে না থাকলে এত বড় কাজ কখনো সম্ভব হতো না। সবার সমবেত চেষ্টায় একটা অন্যায় আর সর্বনামের কালো পাহাড়কে ধ্বংস করে কতগুলো নিস্পাপ জীবন বাঁচতে পেরেছি। এ যে দেশ ও দশের জন্য কত বড় খুশি আর সাফল্যের কাজ তা কী করে বুঝাব।

এবার ফেরার পালা। সবাই হৈ হৈ করে হাজার দাড়ি নৌকায় উঠে গেল। বশিতে সুর ধরল ফুলকুমারী। সামুদ্রিক পাখিরা উড়ে এসে বসল পাশে। সবাই আনন্দে গান গেয়ে উঠল।

অদ্ভুত ক্ষমা প্রার্থনা

নওশীন রাঈসা
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ৮
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

সময়টা ১৯৮৯ সাল।

সোহান হাসান ছিলেন একটি বেসরকারি কলেজের শিক্ষক। তার স্কুল জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু মিরাজ একদিন তাকে চিঠি পাঠালেন যে, মিরাজের বাড়িতে তাকে যেতেই হবে। অনেকদিন দুই বন্ধুর দেখা হয় না। তাই সোহানও ঠিক করে আগামী শনিবার সে মিরাজের বাড়ি যাবে। মিরাজের বাড়ি চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেখানে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে ট্রেন। তাই সোহান শনিবার দুপুর তিনটায় স্টেশনে পৌঁছায়। ট্রেন আসবে ৪টায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে জানতে পারল যে, ট্রেন আরও তিন ঘণ্টা পর আসবে। সোহান চিন্তায় পড়ে যায়। কারণ, মিরাজ স্টেশনে সোহানের জন্য অপেক্ষা করবে। যদি ট্রেন ঠিক সময়মতো গন্তব্যে না পৌঁছায় তাহলে মিরাজ তো বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে না, তাও আবার তিন ঘণ্টা! যাই হোক, সন্ধ্যা সাতটায় সে ট্রেনে চড়ে বসল। পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত ১২টা বেজে গেল। স্টেশনে নামে সোহান দেখল, মিরাজ তো নেই-ই, উল্টো পুরো স্টেশন ফাঁকা। সোহান স্টেশন মাস্টারের ঘরে তাকিয়ে দেখল, আলো জ্বলছে। সে ভেতরে ঢুকে স্টেশন মাস্টারের সাথে কথা বলল। সব শুনে সে বলল, 'এত রাতে আপনার একা যাওয়াটা ঠিক হবে না। কারণ, এখানটায় প্রায়ই অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে থাকে। রাতটা কোনো রকমে এখানে কাটিয়ে দিন। কাল ভোরেই না হয় তাই স্টেশন মাস্টার সোহানের সাথে জগাই নামে একটি ছেলেকে দিয়ে দেয়, যেন সে সোহানাকে পুরো রাস্তা সঙ্গ দিতে পারে। জগাই ছেলেটি খুব চটপটে ও সাহসী ছিল। সোহান আর জগাই গ্রামের আধো আলো, আধো অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকে। জগাই একটা গেঞ্জি ও প্যান্ট পরে আছে। সোহান জগাইকে জিজ্ঞেস করল,

–জগাই, এই গ্রামের রাস্তাগুলোকে রাতের বেলা সবাই এত ভয় পায় কেনো বল তো?

–স্যার, এখানে একটা পুকুর আছে, রাস্তার ধারেই। আমাদের গ্রামের জসীম পরীক্ষায় ফেল করে ঐ পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। শিক্ষকদের উপর তার খুব অভিমান ছিল। তাছাড়া স্থানীয় একটি তেঁতুল গাছে আমাদের গ্রামেরই আসাদের মা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সবাই বলে তাদেরই আত্মা নাকি রাতে চলাচল করে। সোহান শুনে হেসে ফেলে এবং বলে,–

–জগাই, একটা বাজি ধর। যদি তুই আজ এ রাতে আমাকে ভূত দেখাতে পারিস, তবে আমি তাকে এক হাজার টাকা দেব।

–কী যে বলেন, স্যার।

কিছুদূর হাঁটার পর সোহান জগাইকে বলল,

–"তুই এবার চলে যা। আমি একটাই যেতে পারব।"

–স্যার, সত্যি বলছেন তো? আপনি পারবেন একা যেতে? ভয় পাবেন নাতো?

–না ভয় পাব না তুই চলে যা।

জগাই কী যেন ভেবে চলে গেল। ওর চলে যাওয়ার পর একা একা সোহানের কেমন যেন ভয় লাগতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটত হাঁটতে একটি পুকুরের সামনে এসে পড়ে সোহান আর বুঝতে পারের তার পেছনে পেছনে কেউ তাকে অনুসরণ করে হাঁটছে। সোহান পেছনে তাকিয়ে দেখল একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে তার শাল জড়ানো। মুখটা ফ্যাকাশে কালো, কেমন যেন আবছা অন্ধকার। সোহান তাকে জিজ্ঞেস করল,

–কে?

-স্যার আমি জগাই।

সোহান ভাবল, জগাইকে এমন দেখতে লাগছে কেনো? তাছাড়া ওর গায়ে তো কোনো শাল জড়ানো ছিল না। আর ও তো চলে গের। এখানে এলোই বা কখন? কেনই বা এলো? সোহান জিজ্ঞেস করল,

–তুই শাল কোথায় পেলি?

–কী করব স্যার, খুব শীত করছিল, তাই। এ বলেই অদ্ভুত রকমের একটা হাসি দিল। আর ঠিক এ সময়ই জগাই দৌড়ে গিয়ে টুপ করে পুকুরটিতে দিয়ে ঝাপা দিয়ে ডুবে গেল। এসব দেখে সোহান কিছু বুঝে উঠতে পারল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

যখন সোহানের জ্ঞান ফিরল তখন সে নিজেকে হাসানের (মিরাজ) বাড়িতে আবিষ্কার করল। যখন যখন জ্ঞান ফিরল, দেখল ওর সামনে মিরাজ আর জগাই বসে আছে। সোহান জগাইকে বলল, জগাই, আমি রাতে কিছু দেখেছি। এ নিয়ে আমাকে কোনো প্রশ্ন করিস না। আমি কিছু বলতে পারব না। এই নেতার ১০০০ টাকা।

জগাই কেমন যেন অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে টাকটা হাতে নিয়ে চলে গেল। প্রায় ৩ বছর পরের একদিন। মিরাজের বাড়িতে সোহান এসেছে ঝড়ের রাতে সোহানকে কিছু বলতে এসে না বলেই জগাই চলে যায়। এরও কিছু দিন পরের ঘটনা। একদিন খুব ঝড় হচ্ছিল– এমনি এক রাতে সোহানা ঘুমুতে যাবে, ঠিক সে সময় কে যেন সোহানের ঘরের দরজায় কড়া নাড়ল। দরজা খুলে দিয়ে কে জিজ্ঞেস করতেই আগত ব্যক্তিটি বলল, 'স্যার আমি জগাই। চিনতে পারছেন আমাকে?"

সোহান চিনতে পেরে জগাইকে বলল, তুই ভাল আছিস্ ? তা এত ঝড়বৃষ্টির রাতে তুই কিভাবে এখানে এলি? কেনইবা এসেছিস? কোনো বিপদ হয়নি তো?

–তখনি জগাই সোহানের হাত ধরে কেঁদে দিয়ে বললো, "স্যার আমার বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে। আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।"

কথা গুলো বলেই জগাই দৌড়ে মিলিয়ে গেলো। সোহান দেখলো জগাই কেমন অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। কোথাও ওকে আর দেখা গেলো না।

পরদিন সকালে সোহান একটি চিঠি পেল। চিঠিটি ওর বন্ধু মিরাজের। খামটায় দুটো চিঠি ছিলো। চিঠিটি সোহান খুল্‌লো, চিঠিতে এক হাজার টাকা আছে এবং সঙ্গে আছে একটি চিঠি আরেকটি চিঠি ছিলো বন্ধু মিজাজের। প্রথম চিঠিটি ছিলো এই রকম–

প্রিয় সোহান স্যার,

আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। কী ভুল করেছি, তাই ভাবছেন তো? সেদিন আপনি বললেন, ভূত দেখাতে পারলে আমায় এক হাজার টাকা দেবেন। ঐ সময় আমার মা খুব অসুস্থ ছিলো। খুব টাকার দরকার ছিলো। যখন শুনলাম, আপনি অতগুলো টাকা দেবেন, লোভ সামলাতে পারিনি। আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরে আমি মুখে কাঁদা মাটি মেখে, শাল গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আপনাকে ভয় দেখাবার জন্য পুকুরে ঝাপ্ দেই। টাকাটা নিয়ে কেমন একটা অপরাধ বোধ হচ্ছিলো। কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। তাই টাকাটা ফিরিয়ে দিলাম। আপনার বাসা আমি চিনি না। তাই মিরাজ স্যারের বাসায় টাকাসহ চিঠিটি রেখে গেলাম। স্যার– আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

ইতি

জগাই।

দ্বিতীয় চিঠিটি সোহান খুললো। তাতে লেখা আছে–

প্রিয় সোহান,

আশা করি ভালো আছিস। জগাই সত্যি না বুঝে অপরাধ করেছে। কিন্তু নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছে। জানিস, এই দুই দিন আগে জ্বরে পড়ে ছেলেটা মারা গেল। মারা যাওয়ার আগের দিন অসুস্থ অবস্থায় আমার কাছে চিঠি আর টাকাটা দিয়ে গেলো। ছেলেটা না বুঝে ভুল করেছে। ওকে ক্ষমা করে দিস্।

ইতি

মিরাজ

চিঠিটা পড়তে পড়তে সোহানের হাত কাঁপছিল। কোনটা সত্যি? জগাই যদি মরে গিয়ে থাকে, তবে কার রাতে আমার ঘরে কে এসেছিল? তাহলে জগাই কি মরে গিয়েও ক্ষমা চেয়ে গিয়েছে। টাকাটা হাতে নিয়ে ঝাপসা হয়ে এলো সোহানের চোখ। এ ঘটনার ব্যাখ্যা সোহান আজও খুঁজে পায়নি।

রাজবাড়ির রহস্য

তাসনিমা জাহান খুশবু
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ৪৩
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

একদা এক গ্রামে বাস করত পাঁচ বন্ধু। শিশির, শিথিল, শ্রেয়ান, ডার্নিয়াল ও নেহা। এই পাঁচ বনধুর জুড়ি মেলা ভাড়। একে অপরের জীবন। এক বন্ধু বিপদে পড়েছে তো বাকি তাকে সবাই বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন বাজি রাখতে রাজি। যাই হোক পাঁচ বন্ধু সিদ্ধান্ত নিল তারা (advencher) এ যাবে। শ্রেয়ান বলল, রাজবাড়ি চল। একটু ভৌতিক ভৌতিক বাড়ি। শিশির বলল না শুনছি সবাই বলে বাড়িটা ভূতের বাড়ি। কিন্তু বাকি সবাই সম্মতি জানাল। তাই শিশিরকে রাজি হতে হলো। তবে একটু মনমরা হয়ে বসে রইল। পরদিন তারা সকাল ১১টায় রওনা হলো। তাদের পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত হয়ে গেল। তবে অবশেষে তারা রাজবাড়িতে পৌঁছাল। সবাই একসাথে চিৎকার করে উঠল। নেহা বলল, আস্তে আস্তে তারা সবাই এক সাথে বাড়িতে ঢুকে গেল। বাড়িতে ঢুকে সবাই কিছুতেই বুঝতে পারল না। এত বাতি জ্বালানো কেন? নেহা কিছুটা থমথমে বোধ করল। হঠাৎ শিথিল চিৎকার করে উঠল। ডার্নিয়াল বলল কী হয়েছে? শিথিল বলল মোমবাতিটা পড়ে গেছে। সবাই হেসে উঠল ওর কথা শুনে। হঠাৎ নেহা দেখল ওর সামনে অর্থাৎ সবার সামনে দিয়ে একটি মেয়ে মোমবাতি হাতে চলে গেল। হাসাহাসির জন্য সবাইকে খেয়াল না করলেও শ্রেয়ান, নেহা ও ডার্নিয়াল দেখল। নেহা শিশির ও শিথিলকে জানাতেই শিশির বলল, আগেই বলেছিলাম বাড়িটা ভালো নয়। হঠা কে যেন বলে উঠল কে বলছে বাড়িটা ভালো নয়। রাজবাড়িতে কেউ এলে তার আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি হয় না।

তোমরা এসেছে যতদিন থাক তার পর চলে যাও। আর যদি পার আমাদের মুক্ত করে যাও। নেহা বলল, কে আপনারা? আপনাদের আমরা কিভাবে সাহায্য করব? কিভাবে মুক্ত করব আপনাদের? আমি তোমাদের সব বলব। তবে আজ নয় কাল। এখন অনেক কাল বলব। নেহা সবার আগে ঘুম থেকে উঠল। তারপর সবাইকে ঘুম থেকে ডেকে তুল। শ্রেয়ান বলল, তুই এত সকালে ঘুম থেকে উঠেছিস নেহা? হ্যাঁ আসলে কাল রাতে আমার ঘুম হয়নি। শুধু মনে হয়েছে কে যেন নূপুর পড়ে নাছছে। নেহা বলল, শ্রেয়ান বলল, নূপুর পরে কে নাছছে। সবাই জানতে পারবি, কিভাবে? নেহা তার প্রতি উত্তরে বলল, কেন কাল রাতের কথা ভুলে গেলি। না ভুলিনি নেহা বলল। ওদের দুজনের কথাবার্তার মধ্যে বাকি সবার হাত-মুখ ধোয়া হয়ে গেছে। শিথিল বলল, তোরা এত কথা কেন বলছিস? আমার তো ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ডার্নিয়াল তার প্রতি উত্তরে বলল, তোর মত ভীতু ছেলে আমি এই প্রথম দেখলাম। তোদের সব কথা বন্ধ কর আর নিচে চল। দেখি সেই অজানা ব্যক্তির অজানা রহস্য আমরা সবাই উদার করিতে পারি কিনা। চল নিচে চল। শিশির বলল, সবাই নিচে গেল। নিচে গিয়ে সবাই খাওয়া-দাওয়া করল। হঠাৎ সেই অজানা ব্যক্তি আবার বলল, আমাদেরকে বাঁচাও, আমাদেরকে বাঁচাও। আমাদের মুক্ত করো নেহা প্রায় বিরক্ত হয়ে বলল, আপনি কে? আপনাকে আমরা কিভাবে মুক্তি করব? আর আপনি বারবার কেন একই কথা বলছেন? সেই অজানা ব্যক্তি বলল, বেশ তবে শুনো আমি কে? আমি এক সময় এ রাজ্যের রাজা ছিলাম। আমি বেশ সুখে আমার রাজ্য পরিচালনা করতাম। আমার রাজা ছিল প্রায় উপদ্রব মুক্ত। মাঝে মাঝে দুএকটা বিচার আসত। বিচার করতাম। এই আমি সব সময় সত্যের আশ্রয় নিতাম– তবে একবার আমি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলাম, যা আমার জন্য আমার বিপর্যয় নিয়ে এলো একবার বিচার নিয়ে এলো। আমার মন্ত্রী ও এক ফকির মন্ত্রীকে আনি অজানা দিয়ে সাজা দিয়েছিলাম ফকিরকে অথচ সকল দোষ ছিল মন্ত্রীর।

সেই ফকির আমাকে অভিশাপ দিল আমি এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যাব। আর কেউ তার টের পাবে না। আমি সামান্য চিন্তিত হলাম। রাখী আমাকে আশ্বস্ত করল। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। আমি এক প্তাহের চতুর্থদিন বাড়ির পিছনে কুয়ার মধ্যে পড়ে মারা গেলাম। কেউতা ঘুনাক্ষরে টের পেল না। আমার আত্মার শান্তির জন্য বাড়ির পিছনের ঐ কুয়ো থেকে একটা পদ্ম এনে আমার এ বাড়ির সামনে রাখতে হবে। পদ্মটা যদি শুকিয়ে যায় তাহলে আমার আত্মার শান্তি হবে। যদি তোমরা পার তাহলে আমার এই উপকারটা করে যাও। হঠাৎ একটা দূরূহ আওয়াজ হলো। শ্রেয়ান চিৎকার করে উঠল। নেহা বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কি হচ্ছে আমাদের সাথে। ডার্নিয়াল বলল, কিছুই না এখন আমরা বাড়ির পিছনে যাব কুয়ো থেকে ফুল তুলব। বাড়ির সামনে রেখে চলে যা। ব্যাস আমাদের কাজ শেষ। তুই যেভাবে বলছিস যেন মিনিটের কাজ। আমার তো ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। শিথিল বলল, শিশির ওর কথায় সায় দিল শ্রেয়ান কিছুটা রেগে বলল যা না বা বাড়িতে গিয়ে মায়ের আঁচল ধরে শুয়ে পড়। শ্রেয়ান কাকে বলল বুঝা গেল না। তবে মনে হয় শিশির আর শিথিলকে বলল, নেহা বলল, আচ্ছা হয়েই এবার চল। শ্রেয়ান বলল হ্যাঁলো যাই সবাই বাড়ির পিছনে যাওয়ার পরই কুয়ো দেখতে পেল। অতঃপর শ্রেয়ান কুয়ায় নামতে চাইল। কিন্তু জার্নিয়াল বাধা দিল শ্রেয়ান বলল, এত ভয় পাস না-আমাকে একটু ভরসা কর ডার্নিয়াল বলল তোকে ভরসা করতে পারছি। কিন্তু শ্রেয়ান বলল, কোনো কিছু না। চুপ থাক। শ্রেয়ান অনেকক্ষণ ধরে একটা পদ্মা ফুল ছিঁড়ল সবাই অনেক জোরে চিৎকার করে উঠল। নেহা বলল, যে পুকুরে নামতে গেলে ভয়ে চিৎকার করে উঠে তার এত সাহস জানতাম না তো? সবাই উচ্চস্বরে হেসে উঠল। যাকে বলা যায় অষ্ট হাসি।

তারা সবাই বাড়ির সামনে পদ্মা ফুলটা রেখে চলে গেল। তারা দেখল পদ্মাফুলটা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ফুলটি শুকিয়ে গেল। তারা বুঝল কারও আত্মার শান্তি হয়েছে। তবে কার সেটা বুঝতে পারলাম না। সেটা একটা রহস্যই রয়ে গেল।

একটি সাইকেলের গল্প

পূজা ধর
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ৫৪
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

মা রাতের খাবার শেষ করে রনির ঘরে গেল। ঘরে গিয়ে দেখে রনির মুখ খুব কালো। চারদিকে বইয়ের ছড়াছড়ি। তা দেখে মা বললেন, এভাবে কেউ ঘর এলোমেলোক করে রাখে। রনির ঘরটা খুব ছোট তাই ঘর এলোমেলো হয়ে থাকলে আরও বেশি অগোছালো লাগে। রনির পাশে গিয়ে বসল তার মা। ছোট মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় মা। হাত বুলাতে বুলাতে মা বলে, দেখ বাবা, তোর বাবার মাসিক বেতন খুব কম। তাই যখন তখন সবকিছু দিতে পারে না। এটা তোমার বুঝতে হবে। রনি মায়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে। যা আর কথা না বলে রুমে চলে গেল। রনির মন খারাপের কারণ হলো একটা সাইকেল। তার সব বন্ধুরা সাইকেল চড়ে স্কুলে যায়। সে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। একদিন তার বন্ধু রিফাতের সাইকেল সে বসতে চাইলে রিফাত তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। রনির খুব কষ্ট হয় সেদিন। কিন্তু রনিদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। তার ওপর রনির পড়ার খরচ। রনিকে সাইকেল কিনে না দিতে পেরে তার বাবাও খুব কষ্ট পায়। তার অফিসের সবাই বলে রনিকে একটু পুরনো সাইকেল কিনে দিতে। রনির বাবা একটা সাইকেলের দোকানে দাঁড়িয়ে থাকে। একদিন দোকানদার তাকে বলে, কি নিবেন ভাই? রনির বাবা বলে, আমি এমনিই দাঁড়িয়ে আছি। দোকানদার বলে। চুরি করার পায়তারা করছেন। চলে যান এখান থেকে কথাটি রনির বাবার মনে লাগে তিনি বাসায় এসে কান্না করেন। রনির মা জিজ্ঞেস করলে বলেন, ছেলেটার একটা সাধ আমরা পুরণ করতে পারছি না। কেমন বাবা-মা আমরা। রনি চলে আসায় কথা বন্ধ হয়ে যায়। পরের দিন ছিল রনির জন্মদিন। রনি ঘুম থেকে উঠেই দেখে তার সামনে সাইকেল। কিন্তু সেদিন থেকে তার বাবার পছন্দের ঘড়িটা আর তার হাতে দেখা যায়নি।

আটকুড়ে বুড়ি

তামান্না আক্তার
শ্রেণি : ৯ম, রোল : ০৩
শাখা : খ, বিভাগ : ব্যবসায় শিক্ষা
শিফট : প্রভাতী

অনেক সময় আগে পাহাড়ের পাদদেশে ছিল একটি ছোট্ট ঘর। সেই ঘর বাস করে এক বুড়ি। বুড়ির, স্বামী, ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। সংসারের সব কাজ বুড়িকেই একা করতে হয়। ঘরের কাজ সেরে বুড়ি প্রতিদিন যায় দূরবনে কাঠ আনতে। বোঝার ভারে তার শরীর নুয়ে পড়ে। হাত-পা ভেঙ্গে আসে। তবুও তার যতক্ষণ জীবন আছে তাকে কাজ করতেই হবে। বুড়ির মনে অনেক দুঃখ। একটা সন্তানও যদি তার থাকতো তাহলে তাকে এতো কষ্ট করতে হতো না। সন্তান নেই বলে প্রতিবেশীরা তাকে আটকুড়ে বুড়ি বলে ডাকে। পাহাড়ের চূড়ায় আছে এক মন্দির। আটকুড়ে বুড়ি সেই মন্দিরে গিয়ে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করে। একদিন বুড়ি তার ক্ষেত্রে লাউগাছ লাগাচ্ছিল। এমন সময় মাথায় পাগড়ি, গায়ে সাদা পোশাক, কোমরে দামি বেল্ট পরা এক বিরাট আকারের লোক এসে হাজির। বুড়ি লোকটির দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। লোকটি বলল, আমি দেবদূত। দেবতা আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। তুমি যে লাউগাছ লাগাচ্ছে। এই গাছের লাউ থেকেই তোমার ভাগ্যেল পরিবর্তন হবে। লাউগুলো বড় হলে তুমি সেগুলোর ভেতরটা পরিষ্কার করে খোলটা রোদে শুকিয়ে সেগুলো ঘরে এনে রাখবে। এই বলে দেবদূত বাতাসের সঙ্গে মিশে গেছে। অল্প কয়দিনেই বুড়ির গাছে লাউ ধরল। বুড়ি লাউগুলোর যত্ন নিতো। লাউগুলো বড় হবার পর বুড়ি সেগুলো ঘরে নিয়ে এলো। তারপর লাউগুলোর ভেতরটা পরিষ্কার করে খোলাগুলো রোদে শুকালো। বুড়ি সেগুলো ঘরে তুলে রাখল। একদিন অবাক কাণ্ড ঘটলে বুড়ি মনে গেছে কাঠ আনতে। ঘরের ভেতর থেকে ছোট বাচ্চাদের চেঁচামেছি শোনা যেতে লাগল। বড় লাউয়ের ভেতর থেকে একুট ফুটফুটে সুন্দর ছেলে বেরিয়ে এলো। সে অন্যান্য লাউয়ের ভেতর থেকে আরো অনেকগুলো ছোট ছোট মেয়েকে বের করল। বাচ্চার লাউ থেকে বের হয়ে ঘরের বিভিন্ন কাজ করতে লাগল। বড় ভাই কাজ না করে শুধু চুপচাপ দরজার সামনে বসে থাকে। ঘরের সব কাজ শেষ হয়ে গেলে সবাই আবার লাউয়ের খোলের মধ্যে ঢুকে গেল। বুড়ি বন থেকে ফিরে এলে দেখল যে, ঘরের কাজ হয়ে গেছে। বুড়ি তো দেখে খুব অবাক হলো। এভাবেই প্রতিদিন বুড়ি বন থেকে ফিরে এসে দেখে ঘরের সব কাজ শেষ। একদিন বুড়ি বন থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে দেখল যে লাউ থেকে কতগুলো বাচ্চা বেরিয়ে তার ঘরের সব কাজ করে দেয়। বুড়ি তা দেখে অবাক হয়। বুড়ি দেখে যে তার ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভর্তি। বুড়ি খুব খুশি। বুড়ি এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিজের সন্তানের মতো আদর করে। বুড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে তার শেষ জীবন খুশিতে কেটে গেল।

কালবৈশাখী

ফারিহা কামাল
শ্রেণি : ১০ম, রোল : ০২
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

হার্টে ব্লাড সার্কুলেশন, হার্ট অ্যাটাকের কারণ। ব্লাড ভেসেলের গঠন– এগুলো পড়তে পড়তে প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কী মনে হতে জানালার দিকে তাকালাম। আকাশ অন্ধকারে হয়ে গেছে। বোধহয় কালবৈশাখী আসছে। হঠাৎ একজনের কথা মনে পড়ে গেল। সামনে পরীক্ষা; তবুও বই-খাতা অগ্রাহ্য করে উদাস হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজতে লাগলাম।

তখন কিন্ডারগার্টেন পড়ি, নিতান্তই ছোট। 'বন্ধুত্ব' শব্দটার গভীরতা অনুভব করার ক্ষমতা তখন ছিল না। এখন যে রকম

বিরাট ফ্রেন্ড সার্কল, স্কুলের শেষ সময় চলছে বলে আলাদা হয়ে যাওয়ার অবশ্যম্ভাবী এক আশঙ্কায় সবাই মনমরা হয়ে আছি, অনেকেই আবেগের তীব্রতা সামলাতে পারছে না' তখন এসব ফিলিংসের বালাই ছিল না। তাই সে সময় যখন তাকে প্রথম দেখলাম, বন্ধুত্বের লোভে অতিরঞ্জিত করে নেয় কিংবা হিংসা করার সুযোগ খুঁজতে ত্রুটিসর্বস্ব করেও নয়' বরং যেমনটি সে ছিল, ঠিক তেমটি হয়েই বোধহয় আমার চোখে ধরা দিয়েছিল। মেয়েটার বয়স আমার মতোই হবে– সাত কি হয়। ইউনিফর্ম গায়ে যেদিন সে প্রথম ক্লাসে ঢুকল, সেদিন কেন জানি না, প্রথমেই আমার চোখ গিয়েছিল ওর চোখের দিকে আর সাথে সাথে সেই চোখ দুটো দেখে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিলাম। কারণটা বলি–

ছোটবেলায় মূর্তি দেখতে আমি বাবার কাঁধে চড়ে পুরোটা শাঁখারী বাজার চক্কর দিতাম। আম্মু বলত, "ও তো ছোট, মূর্তি দেখে যদি ভয় পায়?" আর বাবাকে ধমক দিত। কিন্তু তাতে কী? আমি আর বাবা ঠিকই লুকিয়ে লুকিয়ে চলে যেতমা। তবে বলে রাখি, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির স্ট্যাচুগুলো দেখে আমি একবার সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম! তবে সেটা আরও ছোটবেলার কথা, হাসির কিছু নেই!

একবার,কোনো এক মন্ডপে কোনো একটা দেবীমূর্তি দেখে আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কি সুন্দর। তার ওই চোখ দুটি যেন টানা টানা দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকেই তাকিয় ছিল। কোঁকড়ানো কালো চুলের রাশ নেমে আসছিল মাটি পর্যন্ত। সেই অপরূপ রূপের অধিকারিনীটিকে কোন মানুষটি যে গড়েছিল, আজও জানতে ইচ্ছে করে। মেয়েটার চোখ অবিকল সেই দেবী প্রতিমার মতো। আর তার চুলগুলো যেন একরাশ কালবৈশাখীর কোঁকড়ানো মেঘ। সে এসে আমার পাশেই বসল। আগেপিছু চিন্তা না করে কথা বলার অভ্যাস আমার ছোটবেলা থেকেই। তাই ওকে ফট্ করে জিজ্ঞাসা করে বসলাম– তুমি কি দেবী?"

সে একটু ক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর হাসতে শুরু করল। আমি বুঝলাম না এতে হাসির কি আছে? হাসি থামার পর বলল, 'আমি বৈশাখী।'

ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই প্রথম দিনের কথা ওইটুকুই। বৈশাখী স্কুলে খুব কম আসত। তবে যেদিনই আসতকোণার দিকের একটা বেঞ্চে বসে চুপচাপ ক্লাস করে চলে যেত। কারো সাথে তেমন কথা-টথা বলত না। খুব ইনট্রোভার্টেড ছিল বলে ওকে নিয়ে আমার খুব বেশি স্মৃতি নেই। শুধু যখনই ওকে দেখতাম, মনে হতো বুদ্ধি ছোট্ট কোনো দেবী প্রতিমা ভুল করে মর্ত্যে এসে পড়েছে আর অঙ্ক মেলাতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে! মাঝে মাঝে আমার কাছেও অঙ্ক নিয়ে আসত। তখনই যা একটু কথা হতো। সে প্রায়ই বলত– 'আমার অঙ্ক ভালো লাগে না।' আমি অবাক হয়ে বলতাম– 'অঙ্ক তো অনেক সোজা, শুধু হিসাব করলেই হলো।' সে বলত– 'আমার সব হিসাব গণ্ডগোল হয়ে যায়।' বলেই সে হেসে ফেলত। আমিও হাসতাম!

একদিনের কথা খুব মনে পড়ে।

করিডোরে টিফিন আওয়ারে আমি আর বৈশাখী রেলিংয়ে হেলান দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ সে উদাস গলায় বলল, 'আমি বোধহয় আর স্কুলে আসব না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম 'কেন?'

সে বলল, 'আমার খুব খারাপ ধরনের একটা অসুখ নাকি করেছে। ডাক্তার বলেছে ফুল বেড রেস্ট নিতে। তাই মা-বাবা বোধহয় আর আসতে দেবে না।'

আমি বললাম 'কী অসুখ?'

সে বলল, 'মা আমায় বলে নি।' একটু পরে বলল, 'আমি হয়তো মারা যাব।'

'কেন?'– আমি অবাক!

'জানি না, কালরাতে মা খুব কাঁদছিল আর বলছিল আমি নাকি বাঁচব না।'– বলে বৈশাখী উদা হয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। একটু পরে বলল, 'তুমি জানো, মরে গেলে আমাকে সবাই পুড়িয়ে ফেলবে।'

আমি আবারও বললাম, 'কেন?' তখনো জানতাম না যে, হিন্দুধর্মমতে মৃতদেহ দাহ করতে হয়।

সে বলল, 'এমনই নিয়ম।'

তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম আমি। সেই ছোট্টবেলার ছোট্ট কথা মাথা মৃত্যুকে মেনে নিতে পারছিল না। এখন একটু বড় হয়েছি, মৃত্যুবিষয়ক কঠিন সত্য আর বাস্তববাদী যুক্তিগুলো জানি। তবুও কেন জানি না, কেউ চলে গেলে মেনে নিতে পারি না এখনো। যাই হোক প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

সেইদিনই বৈশাখীর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল। কারণ, তার কয়েকদিন পরই স্কুল চেঞ্জ করি, দুনিয়ায় এতকিছু থাকতেও বাধ্য হয়ে পড়াশোনা ভালোবাসতে শিখি এবং 'সম্পূর্ণ নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন' এক ঝাঁক বন্ধুদেরর পাল্লায় পড়ে যাই। তাই আস্তে আস্তে সেই মেয়েটা,প্রথমদিন যাকে দেবী বলে ভুল হয়েছিল এবং শেষ দিন যে মারা যাবে বলছিল, তার কথা আমি প্রায় ভুলেই যাই। তার ভয়ানক ধরনের অসুখের কথা অজানাই থেকে যায়।

আনুমানিক দেড় বছর পরের কথা। আমি বসে আছি আমার সবচেয়ে আপন রুমে। আমার রিডিংরুমে। ঝড় হচ্ছিল বলে জানালা বন্ধ ছিল। হঠাৎ আম্মু এসে জিজ্ঞেস করল,

'তোমার আগের স্কুলে তোমাদের সাথে খুব সুন্দরমতো দেখতে একটা মেয়ে পড়ত না? বৈশাখী নাম?'

'হুম, মনে পড়েছে।'

'মেয়েটা আজ সকালে মারা গেছে। এতক্ষণে বোধহয় দাহ করাও শেষ।'

'কীভাবে মারা গেল?'

'ব্লাড ক্যান্সার ধরা পড়েছিল; লাস্ট স্টেজ ছিল।'– বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আম্মু চলে গেল।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিলাম। ওর চোখদুটো তাহলে আর কোনদিনও দেখতে পাব না? কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না, আমার শৈশবের সেই জীবন্ত দেবীমূর্তি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। প্রচণ্ড শব্দে একটা বাজ পড়ল কোথাও। আমার মনে হলো ওটা বুঝি আকাশের আর্ত চিৎকার।

বৈশাখীর যে অঙ্কগুলো মিলত না; সেগুলোর হিসাব আমি সবসময় মিলিয়ে দিতাম। কিন্তু আজ প্রথমবারের জন্য আমার সব হিসাব গণ্ডগোল হয়ে গেল।

এসব অনেক আগের কথা। এখন ব্যস্ততার সময়। সামনে এসএসসি। মাথায় অনেক চাপ। কিন্তু, যখনই আকাশ কালো হয়ে কালবৈশাখী নামে, ওকে আমার মনে পড়ে যায়। রাস্তাঘাটে কোনো দেবীমূর্তি দেখলে মনে হয় ওকে দেখছি। জানালা দিয়ে দূরের কালো মেঘগুলোকে ছুটে আসতে দেখে আজও ছেলে মানুষের মতো মনে হয়। দেরি গিয়েছে বলেও ক্লাসের দিকে ছুটে আসছে তার কালো চুলের রাশ উড়িয়ে। আজও যখন হঠাৎ হঠাৎ ওর কথা মনে পড়ে, তখন আমার বড্ড মন কেমন করে। জানি না কেন...।

নাম না থাকলে কী হতো

তানজিলা ইয়াছমিন
শ্রেণি : ১০ম, রোল : ০৫
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব নাম রয়েছে। আমাদের বাবা-মা, ভাইবোন বা বয়োজ্যেষ্ঠরা আমাদের নামকরণ করে থাকেন। যেমন : রহিম, করিম, ফারিহা, মীম প্রভৃতি। তবে আমাদের নামের সংজ্ঞা জানা উচিত। যে নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা বা সম্বোধন দ্বারা ব্যক্তিবিশেষে এক জনকে চিহ্নিত এবং নির্দিষ্ট করা যায় তাকে নাম বলে। যাই হোক, কথা হলো আমাদের নাম না থাকলে কী হতো? ধারণা করা হয়, যদি নাম না থাকত, তবে স্বয়ং খোদাতায়ালা মানুষ সৃষ্টির সময় সিরিয়াল নম্বর দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দিত। যেমন : বর্তমানে অবস্থিত কোন বাবাকে তার মেয়ে 'বাবা' বলে সম্বোধন করত। তখন হয়তোবা বলত ৯৬×১০^{৯৮} বা বাবা মেয়েকে ডাকত ৯৭×১০^{৬০}। তখন বর্তমানের মতো এত সম্বন্ধ আর থাকত না। এখন শুধু এই নামই যা একজনের সাথে অপরজনের সম্পর্ককে টিকিয়ে রেখেছে। আবার বৈজ্ঞানিকের ভাষায় বলতে গেলে তখন প্রতিটি শহরে একটি করে নির্দিষ্ট কোড থাকত আর তখন সিরিয়াল নম্বর থাকত হসপিটালের। যেমন " পিজি হসপিটালে জন্মগ্রহণ করা কোনো শিশুর কোড D-২০০০৯২ হলে মেডিকেলে জন্মগ্রহণ করা শিশুর কোড হতো ৫০০০০৭৩। যা-ই হোক, মধুর সম্পর্কের সৃষ্টি হয় এই নাম থেকে। একজন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার বাবা-মা তার সমস্ত ভালবাসা, মমত্ব দিয়ে তার নাম রাখে। আর স্কুলে জীবনে বন্ধুরা আলাদা নাম রেখে বন্ধুত্বতা প্রকাশ করে। নাম না থাকলে সকল আবেগ ঢাকা পড়ে যেত ইশারার তলে। হয়তো তখন মানুষের মনের কোমলতা, ভালোবাসা, আবেগ কেমনটা যান্ত্রিক রোবটের মতো হতো। কোনো সন্তান থাকে মাকে 'মা' নামক মধুর নামটিতে ডাকত না। কোন বন্ধু তার বন্ধুকে 'দোস্ত' বলে আবেগে আপ্লুত করত না। হয়তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুলের মতো সাহিত্য রচিত হতো না। হয়তো সভ্যতার কোন পরিচয় থাকত না। হয়তো আমরা বাঁচার আগ্রহ, উদ্দেশ্য, উদ্যম কিছুই পেতাম না শুধুমাত্র এই 'নাম' না থাকলে।

'শূন্যতা'

আফসানা আক্তার মীম
শ্রেণি : ১০ম, রোল : ০৮
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

উচ্চবিত্ত পরিবারের একমাত্র সন্তান আশরাফ। বাবা শফিকুল ইসলাম একটি বড় টেক্সটাইল কোম্পানির মালিক। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যেমন সৎ তেমনি মানবিক দিক থেকেও দয়ালু। টাকা-পয়সার কমতি ছিল না তার। এত টাকা থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে কোনো অহংকার ছিল না। আত্মীয়স্বজনকে যথাসম্ভব সাহায্য করতেন। ভুলেও টাকা ফেরত নেয়ার কথা ভাবতেন না। এত দয়ালু আর দানশীল মনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞ ছিল না তার আত্মীয়স্বজনেরা। টাকার লোভ সামলাতে না পেরে শফিক সাহেবের চাচাতো ও ফুফাতো ভাইয়েরা ধীরে ধীরে কাজ নিতে থাকে তার কোম্পানিতে। শফিক সাহেবেরও এত কোনো আপত্তি ছিল না। কেননা, নিজেদের আত্মীয় নিতে পেরে তিনি যেন একটু একটু করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। কিন্তু তার এ শান্তি বেশিদিন তার কপালে লিখা ছিল না।

বছর দুয়েক যেতে না যেতেই শফিক সাহেবের মনে হতে লাগল তার কোম্পানির অবনতি বৈ উন্নত হচ্ছে না। কিছুতেই যেন তিনি হিসাব মিলাতে পারেন না। নানান জায়গা থেকে তার কোম্পানির বিরুদ্ধে উঠে আসছে অভিযোগ। কিন্তু তার সাত-আট বছরের ব্যবসায়িক জীবনে তিনি তো কম নাম, যশ, খ্যাতি অর্জন করেননি। তবে এখন কেন এমন হচ্ছে? আত্মীয়-স্বজনদের তো সন্দেহ করার প্রশ্নই উঠে না। পুরনো কর্মচারীদেরও পারছেন না বাদ দিতে। নানা চিন্তাভাবনা মাথায় নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে তাকে। কোনো উপায় ঠাওলাতে পারছেন না। তাকে সম্পূর্ণ নিরুপায় হয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। পারছে না চিন্তার বোঝা মাথা থেকে নামাতে। পরিবারকেও কিছু খুলে বলছেন না। চিন্তার হাত থেকে বাঁচাতে হাতে নেন সিগারেট। ধীরে ধীরে এটা তার মরণ নেশায় পরিণত হয়ে গেল।

মাস কয়েক পরে শফিক সাহেবের শরীরে ধরা পড়ল এক জটিল রোগ। কাউকে কিছুই জানাননি। মনের কষ্ট চেপে রাখতে রাখতে তার অবস্থা যেন ধীরে ধীরে অবনতির দিকেই ছুটছে। ক্রমেই তার মনে হতে লাগল পরপার যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বুঝতে পেরে তার চোখ-মুখে নেমে এলো অন্ধকার। কিন্তু তিনি চান না এ পৃথিবীকে ছেড়ে চলে যেতে। চান না, না ফেরার দেশে পাড়ি জমাতে। শুধুই মনে পৃথিবী যেন ধীরে ধীরে তাকে সবিনয়ে বিদায় জানাচ্ছে।

রাত প্রায় সাড়ে ১০টা। শফিক সাহেব আশরাফকে ডাকলেন। বয়স মাত্র ১০ দশ। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান আশরাফ। খুবই মেধাবী। শফিক সাহেব বারান্দায় ছেলে কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। নীলাভ ছাই রঙে ভরে গেছে আকাশটা। তারাগুলো মিটিমিটি করে জ্বলছে। শফিক সাহেবও অনবরত ছেলের সাথে গল্প করে যাচ্ছেন। শেষে তিনি তার শেষ ইচ্ছার কথা তার ছেলেকে জানিয়ে দিয়ে গেলেন। ও যেন নিজের